(১)

23. 6. 24

দুই বন্ধু

মানুষের মন বড় বিচিত্র। কখনও তার সরল গতি, কখনও বক্রগতি। আবার কখনও লোকচক্ষুর আড়ালে সে গতি পাল্টায়, পশু আর মানুষে এখানেই তফাৎ। পশু তার মনের ভাব লুকোতে শেখেনি, কিন্তু ভগবান মানুষকে সেই ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে সে বাইরের জগতের থেকে নিজের মনের এই সরল বা কুটিল অবস্থাকে আড়াল করে রাখতে পারে। বছরের পর বছর একই ছাদের তলায় থেকেও হয়তো একজন আর একজনের মনের হদিশ পায় না। দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু জোরগলায় বলতে পারে না — 'আমি আমার বন্ধুকে অন্তর থেকে চিনি।'

আজ ১লা বৈশাখ, ১৪৩১ সাল। নতুন বছর শুরু হল। সুপ্রকাশবাবুর জীবনেও আর একটা বছর সংযোজন হল। আজ ওঁর আশিতম বছরের জন্মদিন ছিল। সারা বাড়ীতে বেল, জুঁই, গোলাপ, রজনীগন্ধার ছড়াছড়ি। ওঁর মেয়ে-জামাই, ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনি সবাই এসেছে; খুব হৈ চৈ। আলো দিয়ে বাড়ী সাজানো, সব ঘরে ঘরে ফ্লাওয়ার-ভাসে ফুলের বোকে, খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান, কি নেই! ওঁর ছেলে, মেয়ে-আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের তো ডেকেছেই, তার সঙ্গে ওর পুরোনো দিনের কিছু অফিস-কোলিগ, কিছু জুনিয়র স্টাফেদেরও নিমন্ত্রণ করেছিল, যাদের সঙ্গে এখনও

এত বছর বাদেও যোগাযোগ আছে। খুব ভাল কাটল সন্ধ্যেটা, সবাই ওঁর সম্বন্ধে কত ভাল-ভাল কথা বলল। ছেলে, মেয়েরা বলল, 'বাবা ওদের বন্ধুর মত'। সুমতি, ওঁর স্ত্রী বললেন — উনি অফিসে কিরকম জানি না, তবে বাড়ীর ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তটাই মেনে নিতেন, খুব কমই নিজের জোর খাটাতেন, সবসময় বলতেন, — হোম-ডিপার্টমেন্টটা তোমার, ওখানে আমার নাক না গলানোই ভাল।'

নতুন পাঞ্জাবি, নতুন ধুতি, ফুলের মালা, এত আলো, সুপ্রকাশবাবু যেন সন্ধ্যেবেলা কেমন ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন। বয়স তো হচ্ছে, এর পরের বছর এই দিনটা কিরকম ভাবে আসবে কে জানে! আদৌ আসবে কিনা তাই বা কে বলতে পারে!

এখন ঘড়িতে বারোটা বাজতে পাঁচ। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে আসছে। আচ্ছা, এত ভাল-ভাল কথা, এত সম্মান সবটাই কি ওঁর প্রাপ্য ছিল? একটা বড় দীর্ঘশ্বাস কখন ওঁর অজান্তে বুকটা হাল্কা করে বেরিয়ে এল। পাশের দিকে চেয়ে দেখলেন, গিন্নী-সুমতি পরম নিশ্চিন্তে পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে, ওঁর একটানা ভারী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দে বোঝাই যাচ্ছে উনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সুপ্রকাশবাবু ভাবলেন, যাঁরা বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েন ওঁদের ওপর ভগবানের আশীর্বাদ আছে। ওঁকে

তো রোজ ঘুমের জন্যে যথেষ্ট সাধ্যসাধনা করতে হয়। বই-পড়া, গান-শোনা, সিডি টিভি কি শোনা ..... শেষমেষ ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয়।

না:, ঘুম আসছে না, ঘরে একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। যদিও বাইরের রাস্তার আলোটা তেরছা হয়ে পড়ে ঘরের মধ্যে অনেকটাই আলোকিত করে কিন্তু ওঁর প্রথম বার হার্ট-অ্যাটাকের পর ছেলে সুনন্দ ঘরে একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বালিয়ে রাখার নিয়ম করেছে।

সুপ্রকাশবাবু বিছানা ছেড়ে জানলার পাশে রকিং চেয়ারটায় এসে বসলেন। আজ গরম একেবারেই নেই, একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ভিজে-মাটির সোঁদা-সোঁদা গন্ধ, নীচে বাগানের হাসনুহানা, কামিনীর মিষ্টি গন্ধ নিয়ে বাতাস যেন ওঁর চোখেমুখে একটা শান্তির প্রলেপ মাখিয়ে দিল, আজ এই উনাশি বছরের জীবনের লাভ-ক্ষতির হিসেব-নিকেশ করতে বসলে লাভের দিকটাই বেশিই ভারী হবে। মনে হচ্ছে — সত্যিই, 'দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশী', আজ এই রাতটা যেন ওঁর সামনে একটা অদৃশ্য আয়না তুলে ধরেছে, যার মধ্যে দিয়ে উনি বর্তমান, অতীত সব দেখতে পাচ্ছেন।

নিজের অজান্তেই কখন নিজের মূল্যায়ন করা শুরু করে দিয়েছেন।

চেহারার দিক দিয়ে দেখতে গেলে উনি সব জন সৌম্য চেহারার ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায় তাই। হাইট – 5-10", রঙ ফরসা না হ'লেও কালো তো কেউ বলবে না, হাঁটেন – straight, সিঁথি ছাড়া। হাসি-ঠাট্টা ভালই বোঝেন, সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও দেন। যথেষ্ট witty. অনেক অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েও ওঁর সান্নিধ্য পছন্দ করে। আজ অফিসের জুনিয়র শুভদীপ ওঁর সম্বন্ধে কত ভাল ভাল কথা ব'লে গেল।

— 'দাদা আমাদের গর্ব, ওঁর কাছেই আমরা কাজ শিখেছি। একজন successful-man বলতে যা বোঝায় উনি তাই, সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন, আর যত রকম সমস্যা নিয়েই ওঁর কাছে গিয়েছি, উনি সবসময় তার একটা সমাধান বাতলে দিয়েছেন, — সে অফিসের ইউনিয়নের সমস্যাই হ'ক; অফিসের সমস্যাই হ'ক বা নিজের পারিবারিক সমস্যাই হ'ক। কখনও কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না। কখনও বলতেন না, 'পরে ভেবে বলব'। ওঁর একটা বড় গুণ, he was a good listener, আমাদের কথা বলার সময় উনি ধৈর্য ধ'রে প্রথমে আমাদের

বক্তব্য শুনতেন তারপর নিজের মতামত দিতেন। ওঁর এই সব ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা, আমাদের মধ্যেও অনেক শান্তি এনে দিত। ওঁর কাছে গেলেই যেন অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। উনি সবসময় অফিসে সাদা শার্ট পরে যেতেন কোনদিন এর ব্যতিক্রম দেখিনি। কর্পোরেট অফিসে কাজ করতে গেলে অনেককেই কিন্তু কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করতে হয়। পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট, খুঁত ধরার জন্য ভিজিল্যান্স বা ইউনিয়নের লীডাররা পিছনে পড়ে থাকে। উনি কিন্তু অফিসের সেই প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত ওঁর সাদা শার্টে কারোকে কাদার ছিটে লাগাতে দেননি। এটা কিন্তু কম বড় কথা নয়। আর অদ্ভুত ওঁর মনে রাখার ক্ষমতা! অফিসের প্রত্যেককে নাম ধরে ডেকে কথা বলতেন, সে বড় অফিসারই হ'ক, জুনিয়র কর্মচারীই হ'ক, বেয়ারাই হ'ক আর গেটকীপারই হ'ক, সবার নাম ওঁর মনে থাকত। ওঁর কাছে অফিসের সবাইকে নিয়ে যেন একটা পরিবার মনে হত।

শুনতে শুনতে সুপ্রকাশবাবু একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন, অনেক ঘটনা ভীড় ক'রে আসছিল, অনেক মুখ অতীতের গহ্বর থেকে উঠে আসছিল। দীপ্ত সুপ্রকাশের এই কর্মীদের সাথে সহজ সরল ব্যবহার মোটেই পছন্দ করত না, ও সবসময়ই বলত,

'এদের মাথায় তুলিস না, পরে পস্তাতে হবে, মালিক এবং কর্মচারীদের মধ্যে একটা class এর difference থাকে, সেটা maintain করাই কাম্য।' অথচ, সুপ্রকাশ বাবু নিয়মিত অফিসে যাওয়া ছেড়েছেন তা বছর দশেক তো হল, এখনও অফিসে গেলে সেই গেটকীপার থেকে সবচেয়ে বড় অফিসারের কাছে সেই সম্মানই পান, এখনও কোন বড় সমস্যা হলেই ছেলে সুনন্দ বাবার শরণাপন্ন হয়।

রকিং-চেয়ারে অল্প অল্প দুলতে দুলতে কখন যে অনেক কটা বছর পিছনে চলে গেছেন খেয়াল নেই। এখন সবে সবে হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করে দুই বন্ধু সুপ্রকাশ আর দীপ্তপ্রকাশ Kharagpur IIT তে Mechanical Engineering এ ভর্তি হয়েছিল। ১৬ বছর বয়স, কলকাতা ছেড়ে বাবা, মা, ভাই-বোন আত্মীয়স্বজন সবাইকে ছেড়ে হোস্টেলে থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া, নতুন পাওয়া স্বাধীনতা, পড়াশোনার নতুন দিগন্ত — সব মিলিয়ে দুজনে দুজনের খুব কাছাকাছি এসে গেল, কলেজে পড়াকালীনই দুজনে অভিন্নহৃদয় বন্ধু হয়ে গেল, সুপ্রকাশের বাবা, মা, ভাই-বোন আছে, দীপ্তপ্রকাশের মা নেই, বাবা আছেন; ওর কোন ভাই-বোন নেই, দীপ্তপ্রকাশের বনেদী বাড়ী, বেশ অবস্থাপন্ন পরিবার। সুপ্রকাশের বাড়ীর অবস্থা

সুপ্রকাশের তবে দীপ্তুর মত আভিজাত্য বা বড়মানুষী কায়দা নেই। দীপ্তপ্রকাশ খুবই মেধাবী ছিল। Higher Secondary তে ও প্রথম ১০০ জনের মধ্যে rank করেছিল। সুপ্রকাশ ততো নয় মেধাবী ছিল তার থেকে অনেক বেশী অধ্যাবসায়ী ছিল।

ছোটবেলা থেকে সুপ্রকাশের মা বলতেন, — 'দেখ, বাবু, তোমার বাবা একজন আদর্শবাদী স্কুলশিক্ষক। তাঁর পক্ষে টাকা দিয়ে তোমাকে কলেজে ঢোকানো সম্ভব নয়। তোমাকে তোমার ভবিষ্যত গড়ে নিতে হবে। জীবনে লেখাপড়া, পরীক্ষার রেজাল্টে যেন নামের আগে দুটো দাঁড়ি না পড়ে'। ও সুপ্রকাশ হায়ার সেকেণ্ডারীতে ১৩টা দাঁড়ি নিয়ে যাবে। ১ম division এ ভাল নম্বর পেয়েই পাশ করে এবং Kharagpur I.I.T. র entrance পরীক্ষায় scholarship ও পায়, আর দীপ্ত তো brilliant, ও তো scholarship পেয়েই ছিল, দুজনে B-tech পাশ করার পর Kharagpur I.I.T. তেই Industrial Engin-eering এ M. Tech. করল, B.Tech, M.Tech দুটো পরীক্ষাতেই দীপ্ত top করল, সুপ্রকাশবাবু আজও ভেবেছিলেন তখন এক একবার মনে হত, আমি যদি দীপ্তুর মত brilliant হতাম, আমারও যদি ঐ রকম বাড়ী, ঐ রকম একটা ভাগ্য থাকত! সত্যি বলতে কি ওর ভাগ্যের জন্য মাঝেমাঝে হিংসেও হত। হায়! আজ সেই ভাগ্যের কথা ভাবতে শিউরে উঠছেন।

M. Tech পাশ করার পর দুজনেই ভাল চাকরীর

offer পেল, দীপ্তর একটা বড় দোষ ছিল, ওর প্রচণ্ড ego ছিল। দীপ্ত বলল, 'দেখ, আমার দ্বারা ওই দশটা-পাঁচটা অফিসের চাকরী বা মাঠে-ঘাটে সাইটে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়। আমি বাবাকে বলে দিয়েছি আমি স্বাধীনভাবে নিজের company খুলে বসতে চাই। ভেবেছি, Engineering instrument and equipments এর business করলে কেমন হয়? বাজারে দারুণ demand. Government থেকেও অর্ডার পাওয়া যাবে, তুই যদি চাস, তুই-ও আমার সঙ্গে join করতে পারিস।'

সুপ্রকাশ কিন্তু ভাল চাকরীর offerটা ছাড়ল না। Multinational Company — salary-ও ভাল, ওর বাবা বললেন, — 'কখনও হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা ঠিক নয়। তুমি দীপ্তর সঙ্গে ব্যবসা করতে চাও, ওর partner হতে পার, পয়সা না নাও, ক্ষতি নেই, তোমার অফিসের কাজের পরে বা অবসর সময়ে ওকে, ওর কোম্পানীকে সাহায্য করতে পার, কিন্তু তোমার মাস-মাইনের চাকরীটা থাকা খুব জরুরী। দীপুরা বড়লোক, ওদের বাঁধা-মাইনের প্রয়োজন নেই।

দীপ্তর কোম্পানীটা দাঁড় করানোর জন্য সুপ্রকাশ খুব খেটেছিল। অফিস ফেরত প্রায় রোজ দীপ্তর অফিসে যেত। সবই ঠিকঠাক চলছিল। এইসময় হঠাৎ দীপ্তর বাবা মারা গেলেন, ভেতরে ভেতরে অনেকদিন ধরেই ভুগছিলেন। নিজের অসুখের কথা কাউকে বলতেন

না। দীপ্ত পুনর্বারেও কিছু বুঝতে পারেনি।

দীপ্তর এখন কোন অভিভাবক নেই, শুধু এক দূর সম্পর্কের পিসিমা ছাড়া। ওর মা মারা যাবার পর তিনিই ওকে মানুষ করেছিলেন, একদিকে কলকাতা শহরে দু'তিনটে বাড়ী, বিষয়সম্পত্তি, জমিজমা, ব্যাঙ্কে ক্যাশ টাকা দীপ্তর একেবারে মাথা ঘুরে গেল। এইসময় কিছু মোসাহেব জুটল। নিজের কোম্পানীতে আসা প্রায় ছেড়েই দিল, সব দায়িত্ব পড়ল সুপ্রকাশের ওপর। সুপ্রকাশের এক একসময় মনে হত দীপ্ত যেন ওকে 'taken-for-granted' হিসেবে নিয়ে নিয়েছিল। সুপ্রকাশ যেন দীপ্তকে সাহায্য করতে বাধ্য। এইসময় দীপ্ত আর এক কাণ্ড করে বসল। এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে দীপিকাকে বিয়ে করে বসল। তারপর সুন্দরী বউ, অনেক টাকা। আজ হানিমুন, কাল বিদেশে বেড়াতে যাওয়া, ক্লাবে যাওয়া, কাল গার্ডেনপার্টি নয়তো 'ওর'-এ বন্ধুবান্ধব নিয়ে dinner. কিছুই বাকী রইল না। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ওদের ছেলে হল। দীপ্ত আর দীপিকা খুব খুশী। ছেলের নাম রাখল 'দ্বৈপায়ন'। ইতিমধ্যে সুপ্রকাশেরও বিয়ে হয়ে গেছে। দীপ্ত আর সুপ্রকাশ ঠিক করল, এবার সুপ্রকাশের মেয়ে হলে দ্বৈপায়নের সাথে বিয়ে দেবে।

একটা জিনিস সুপ্রকাশের খুব খারাপ লাগত দীপ্ত এত বন্ধু কিন্তু ও যেন সুপ্রকাশকে ওর প্রাপ্য

মর্যাদাটা দিত না। কখনও কখনও সুপ্রকাশের এও মনে হত দীপ্ত যেন ভেবেছে ওর কোম্পানীতে সুপ্রকাশকে কাজ করতে দিয়ে ও যেন সুপ্রকাশকে কিনে নিয়েছে। এক একসময় এমন ব্যবহার করত যেন দীপ্তর কোম্পানী-তে ও একজন কর্মচারী বই তো নয়। যদিও সুপ্রকাশ কখনও ওর কোম্পানী থেকে এক পয়সাও নিত না। সেইটাও দীপ্তর ego তে খুবই লাগত, অনেকবার সুপ্রকাশ-কে টাকার offer করেছে, কিন্তু কখনও share offer করে partner হ'তে বলেনি। তাহ'লে সেই পরিস্থিতিতে সুপ্রকাশ কি করত জানি না। দীপ্তর এই ব্যবহার সুপ্রকাশকে খুব আঘাত করত।

এইসময় অফিসের কাজে সুপ্রকাশকে আমেরিকায় যেতে হ'ল দু বছরের জন্য, সুপ্রকাশের স্ত্রী সুমতি তখন M.A. পড়ছিল ও পড়াটা শেষ করল।

বিদেশ থেকে সুপ্রকাশ প্রায়ই দীপ্তকে জিজ্ঞেস করত কোম্পানীর কি অবস্থা? দীপ্ত ভাসা-ভাসা উত্তর দিত। সুপ্রকাশ একটু অবাক হ'ত, দীপ্ত কি চায় না সুপ্রকাশ কোম্পানীর ব্যাপারে interest দেখায়? এই Engineering instruments & equipments company টার জন্য সুপ্রকাশও তো কম পরিশ্রম করেনি, ও কেন ছাড়বে? ও হয়তো দীপ্তর মত টাকা ঢালতে পারেনি কিন্তু কায়িক পরিশ্রম, ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ব্যবসায়িক লেনদেনের আশ্চর্য্য ক্ষমতা আজ এই কোম্পানীটাকে এতটা উন্নতির পথে পৌঁছে

দিয়েছে। বিদেশে থাকতে থাকতেই সুপ্রকাশ হঠাৎ দুঃসংবাদ পেল কোম্পানী ডুবতে বসেছে, দীপ্ত জানাল, শেয়ারের দাম হু-হু করে পড়ে যাচ্ছে। লোকে জলের দরে শেয়ার বিক্রী করে দিচ্ছে। কোম্পানী বোধহয় লাটে উঠল, শুনে সুপ্রকাশের তো মাথায় হাত।

এইরকম ডামাডোলের সময় সুপ্রকাশ দেশে পৌঁছল কলকাতায়।

কথায় বলে, বিপদ কখনও একা আসে না। দীপ্তর হঠাৎ cerebral-stroke হয়ে ওর কথা বন্ধ হয়ে গেল, হাত-পা বেঁকে গেল, মুখটাও বেঁকে গেল। দীপ্ত শয্যাশায়ী হয়ে গেল। সুপ্রকাশ দেখল দীপ্তর বাবার যে পারিবারিক ব্যবসা ছিল, তার অবস্থাও শোচনীয়। দীপ্ত অনেক দিন ঠিকমত দেখাশোনা করেইনি। দীপ্তর বৌ দীপিকা একটা ছোট ছেলে আর অসুস্থ স্বামী নিয়ে দিশেহারা। না, ওদের পথে বসতে হয়নি। বিরাট বাড়ী, গ্রাসাচ্ছাদনের অসুবিধে নেই। কারবার থেকে যাওয়াদাওয়া তো চলেই যাচ্ছে, কিন্তু দীপ্তর সাধের কোম্পানী? তার কি হবে?

সুপ্রকাশ দীপ্তর স্ত্রী দীপিকাকে বলে বাজার থেকে প্রচুর শেয়ার কিনে নিল, কোম্পানীটাকে ও কিছুতেই ডুবতে দেবে না। কোম্পানীর ভেতরে কারখানায় এখনও প্রচুর মেশিন পড়ে আছে আর

বাজার দর কিছু কম নয়। সেইসব মেশিন কিছু সরিয়ে ভাল দামে বিক্রী করতে পারবে। তার মেরেও কিছু টাকার সংস্থান হবে। সুপ্রকাশ কিছুতেই বুঝতে পারছে না কে এই খেলাটা খেলল, ও ম্যানেজারকে ডেকে খাতাপত্র দেখতে বসল। গভর্নমেন্টকে বিক্রী করা জিনিসের টাকা অনেক বাকী পড়ে আছে, কিন্তু খাতায়-কলমে যখন আছে, আজ না হয় কাল টাকা ঠিকই পেয়ে যাবে, প্রাইভেটে বিক্রী যন্ত্রপাতির দাম কতটা উদ্ধার করতে পারবে জানে না। সুপ্রকাশ সবে সবে আমেরিকা থেকে এসেছে ওর হাতে যথেষ্ট কিছু ডলার আছে, ও ঠিক পারবে কোম্পানীটাকে দাঁড় করাতে। ও দেখল, আর একটা নাম — কি some বাজোরিয়া, ঐ নামে প্রচুর শেয়ার কেনা হয়েছে। সুপ্রকাশ ভাবল ম্যানেজারকে ধরতে হবে ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে জানতে হবে, ব্যাপারটা কি? যখন share লোকে বেচে দিচ্ছে তখন ইনি কিনলেন কেন? কে এই বাজোরিয়া? দেখতে হবে ম্যানেজার হরিদত্ত বাবু কিছু জানেন কিনা। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, সেদিনই অফিসে আসার পথে একটা car-accident এ উনি মারা গেলেন। সুপ্রকাশ হরিদত্তবাবুর বাড়ী গিয়ে জানতে পারল উনিই বেনামীতে এই শেয়ারগুলো কিনেছিলেন, কিন্তু সুপ্রকাশ এটা কিছুতেই বুঝতে পারল না একজন ছা-পোষা ম্যানেজার এত টাকা কোথায় পেল? এর পেছনে নিশ্চয় অন্য কোন মানুষের হাত আছে। কিন্তু এখন তাও

এ রহস্যের সমাধান সম্ভব নয়। হরিভূষণ বাবুর বাড়ী থেকে শেয়ারগুলো উদ্ধার করে ওঁর স্ত্রীকে ঐ টাকা ফেরত দিয়ে এল সুপ্রকাশ।

ব্যস, এবার আরম্ভ হ'ল ~~অক্লান্ত~~ অমানুষিক পরিশ্রম, কারখানা, অফিস - এই কোম্পানী একটু stable হতেই সুপ্রকাশ নিজের অফিস থেকে voluntary retirement নিয়ে বহু টাকা হাতে পেল, এবার আর টাকার অসুবিধে রইল না, প্রতিকূলেক নিজের মনোমত ছেলেদের নিয়ে ও আগের অংশে আবার কোম্পানীটাকে দাঁড় করাল, অবশ্য এই কোম্পানীর টার্নওভার কিছু কম নয়।

দেখতে দেখতে অনেক বছর কেটে গেল। গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেল।

একদিন কারোকে কিছু না বলে সুপ্রকাশ দীপুর ছেলে দ্বৈপায়নের সঙ্গে দেখা করল। ওকে জিজ্ঞেস করল এই কোম্পানীতে ও join করতে চায় কি না। তবে দ্বৈপায়ন বলল, ওর এইসবে interest নেই। ও ডাক্তার. গতবছর MD করেছে ophthalmology তে। সুপ্রকাশ দীপুর ছেলেকে FRCS পড়তে বিদেশে পাঠাল।

সুপ্রকাশ ভাবল, সুপ্রকাশও তো কথা রাখেনি, দ্বৈপায়ন দাঁড়াবার আগেই ~~ওর~~ ও ওর মেয়ে সুমনার বিয়ে এক Chartered Accountant ছেলের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে, দীপুদের বাড়ীটাকে ওর কিরকম একটা অভিশপ্ত বাড়ী মনে হয়েছিল ও কিছুতেই ওদের লোভের সঙ্গে নিজের

মেয়ে সুমনার কোম্পানি ডুবে দিতে চায়নি।

সুপ্রকাশ নিজের ছেলে সুনন্দকে এই কোম্পানীতে ঢুকিয়েছে। সে এখন বেশ প্রতিষ্ঠিত। অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করে। Engineering পাশ করে MBA টাও করে নিয়েছে। তার সবার ওপর বাবা সুপ্রকাশ তো আছেই, কখনও কিছু সমস্যা হলেই সুনন্দ বাবার সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান খুঁজে নেয়।

* * * * *

আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সুপ্রকাশবাবু একটু সময়ের জন্য একা বেরিয়েছিলেন, ড্রাইভারও নেননি, দীপ্তির বাড়ী গিয়েছিলেন। এখন দীপ্তি Physiotherapy করে অনেকটা সুস্থ হয়েছে; ওয়াকার নিয়ে কোনমতে ঘরের মধ্যে একটু চলাফেরা করতে পারে। তবে কথা বলতে পারে না বা ডান হাতে কিছু ধরতে পারে না, দীপিকা দীপ্তির ঘরে নিয়ে গেল। দীপ্তি খাটের ওপর বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিল। সুপ্রকাশকে দেখে মনে হল চিনতে পারল, চোখদুটো যেন চকচক করে উঠল, সুপ্রকাশ যে দ্বৈপায়নের নামে share-transfer করেছেন সেই কাগজটা দীপ্তিকে দেখালেন। দীপ্তির চোখে জল, মুখে কেমন একটা বাঁকা হাসি, না কি মুখটাই বেঁকে গেছে বলে ওরকম মনে হচ্ছে সুপ্রকাশবাবুর।

দীপ্তির তো ভেতরে জ্ঞান পরিষ্কার আছে। হাত-পা

বেঁকে গেছে, মুখটা বেঁকে গেছে, কথা বলতে পারছে না, পেন ধরে কিছু লিখতে পারছে না। সুপ্রকাশবাবু বেশীক্ষণ বসলেন না, দীপিকা চা এনেছিল, চা খেয়ে উঠে পড়লেন, সেই ছোটবেলার বন্ধু দীপ্তকে এই অবস্থায় দেখে ওঁর এত কষ্ট হচ্ছিল, উনি আর বসতে পারছিলেন না। সত্যি তো আজ দীপ্ত সুস্থ থাকলে তো কোম্পানীটা ওরই থাকত, হয়তো সুপ্রকাশবাবুকেই সেখানে হাত পাততে হ'ত।

সুপ্রকাশবাবু পিছন ফিরলেন না কিন্তু উনি পিছন ফিরে দীপ্তর মুখের দিকে তাকালে চমকে উঠতেন, কি ভয়ঙ্কর ক্রুর মুখটা হয়েছিল; পারলে দীপ্ত যেন চোখদুটো দিয়ে সুপ্রকাশবাবুকে ভস্ম করে দিতে চাইছিল। সুপ্রকাশ বেচারী জানেও না কোম্পানীর এই দুরবস্থাটা পুরোপুরি দীপ্তর বানানো একটা ছক। যখন দীপ্তদের বাড়ীর অবস্থা খারাপ হয়ে আসছিল, ব্যাংকে টাকার অঙ্ক শূন্যয় ঠেকেছিল তখন দীপ্ত কোনদিকে কোন কুলকিনারা পাচ্ছিল না তখন ও ইচ্ছে করেই কোম্পানীটাকে loss এ run করছে দেখিয়ে share এর দাম কমিয়েছিল। অন্য যাদের share ছিল তারা তাড়াতাড়ি কোম্পানীটা দেউলিয়া হবার আগে জলের দরে share বিক্রী করে দিচ্ছিল আর দীপ্ত ম্যানেজারকে দিয়ে বেনামীতে সব শেয়ার কিনে নিচ্ছিল, এমন সময় দীপ্তর ঐ accident; আর সুপ্রকাশ দেশে ফিরে এসে কোম্পানীর হাল ধরল, দীপ্তর সব

প্ল্যান ভেস্তে গেল। দীপ্ত সুপ্রকাশকে কি করে ক্ষমা করবে? আবার আজ দয়া দেখাতে এসেছে, সইও হতে এসেছে, দ্বৈপায়নের নামে share transfer করতে এসেছে। ছোটবেলা থেকে দেখলে পড়াশোনায় দীপ্তর আগে সুপ্রকাশের কোন তুলনাই হয় না, কোথায় দীপ্তর result আর কোথায় সুপ্রকাশের result! সত্যি কথা বলতে কি ওতো একরকম দয়া দেখিয়েই বলেছিল সুপ্রকাশের মেয়ের সাথে দ্বৈপায়নের বিয়ে দেবে! না, কোথায় সুপ্রকাশের ঐ ছোট ফ্ল্যাট আর কোথায় দীপ্তদের এই সুবিশাল বাড়ী, ঐশ্বর্য! কোন তুলনাই হয় না, আর দীপ্ত শুধু যাকলে ও-ই কি রাজী হত দ্বৈপায়নের সাথে সুপ্রকাশের মেয়ে সুমনার বিয়ে দিতে। যে সুপ্রকাশকে ছোট থেকে দীপ্ত দয়া দেখাতে অনুকম্পা করতে অভ্যস্ত আজ সে কিনা দীপ্তকে দয়া দেখাতে এসেছে! দীপ্তর চোখদুটো জ্বলে উঠল, আজ এই কোম্পানীতে দীপ্তর কোন স্থান নেই, ওটা এখন সুপ্রকাশের কোম্পানী, দীপ্ত কি সে কথা বোঝে না?

* * * * *

রকিং-চেয়ারের দুলুনিতে আর হাওয়া হওয়ায়, ফুলের গন্ধে কখন দুচোখের পাতা বুজে এসেছে, সুপ্রকাশবাবু টের পাননি। হঠাৎ একটা রাত-চরা পাখির কর্কশ ডাকে উনি চমকে জেগে উঠলেন, সত্যি জীবনের খাতার প্রতি পাতায় কত হিসেব-নিকেশ লেখা রয়েছে কিন্তু শেষের দিন কি সাথে নিয়ে যাবেন? আজ ওঁর মনটা খুব হাল্কা লাগছে। এতদিন একটা guilty conscience

ওঁকে prick করত। অবসময় (17) মনে হ'ত দীপ্তর জিনিস উনি অন্যায়ভাবে ভোগ করছেন, তাই দ্বৈপায়নকে অর্ধেক শেয়ার ট্রান্সফার করে উনি যেন পুরোনো বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করলেন। কিন্তু হায়! দীপ্ত কি কিছু বুঝতে পারল?

দিনের শেষে জীবনের হাটে বেচাকেনা সেরে সবাই ঘরে ফেরে তখন কেউ কাঁদে সব খুইয়ে, কেউ লাভের কড়ি গাঁটে বেঁধে। আর্জ সুপ্রকাশ তার সৎ আদর্শকে সামনে রেখে দ্বৈপায়নের নামে অর্ধেক শেয়ার ট্রান্সফার করে দীপ্তকেই তার অধিকার ফিরিয়ে দিতে এসেছিল, কিন্তু হায়! দীপ্ত বন্ধুর হাত থেকে গোলাপের সুগন্ধ না নিয়ে তার কাঁটার আঘাতে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করল। হয়তো এটাই তার ভবিতব্য! কি বিচিত্র মানুষের মন!